প্রথম প্রকাশ : কবিপক্ষ ১৩৫৭

প্রকাশক : রেণুকা রায়, ২৫এ ডাঃ জগবন্ধু লেন, কলিকাতা—১২

মুদ্রক : বঙ্কিমবিহারী দাস, ওরিয়েন্ট প্রেস, ১২৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ লিপি : প্রণব শূর

শ্যাম রায়ের এই গ্রন্থের অধিকাংশই প্রকাশিত কবিতা থেকে সংগ্রহ করা হল। বাছাই করে দেখা গেল বিভিন্ন সময়ের লেখা কিছু কিছু কবিতা চারটি স্তরে সাজানো যায়। সে অনুসারে শ্যাম রায়ের ভূমি-কান্না-গতি-বারুদের সংযোজন।

এই সুযোগে একই গ্রন্থে নিবেদকের "আষাঢ়ের প্রথম দিনে" রচনাটির একটু জায়গা হল। এটা প্রক্ষিপ্ত স্বীকার করি।

কলকাতা থেকে অনুপস্থিতিতে ছাপা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সাহায্য করেছেন শ্রীকানাই লাল দাশ, তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ।·· যাঁরা প্রেরণা দিয়েছেন তাঁদেরও কৃতজ্ঞতা জানাই।

২৫শে বৈশাখ ১৩৫৭ সাল   সুকুমার রায়

সূচীপত্র

কবিপক্ষে নিবেদিত

● ভূমি ●

চাষ

তখন শেষ হল সুন্দরে মধুরে ফুল ফল চষা
তকতকে, ঝকঝকে বাগান—ভরা বাগান—
ঘাট-বাঁধানো কাজল কালো দিঘি-অলা,
চত্বরে চত্বরে মসৃণ ব্রোঞ্জমূর্তি নগ্নদেহী।
বন্ধ হয়ে যায় সিংহদ্বার, সাজানো বাগানে থাকে সুন্দর
কবিরা এসেছিলেন সংগ্রহের তাগাদায়, চলে গেলেন।
গনগনে রোদ ঝাঁপিয়ে পড়ে মাঠে, জমির জালে জল বাঁধা
এবার নতুন বীজ চাষের জন্যে, কথায় কথায় হন্যে।

সেদিন ছিলাম গাছের ছায়ায়, সাজানো মায়ায়
আজকে খেতের পাশে গরু মোষ ধুঁকছে
শূন্য গাড়িগুলো, চাকা বন্ধ, গেছে ছন্দ
পা মচকানো মানুষ, শূন্য থালা বাটি,
এক দঙ্গল ক্ষুধা, এক রাশি অপ্রাপ্তি, অসুর অভিযোগ।
একতারা গানে হাট-বসানো মানুষ আর মানুষ
মতগুলো ফসকায়, পুরা-কথা ধসকায়—
আজকে মরণে নাক গলানো, অথবা ফসল ফলানো।

ধীরে ধীরে থেমে থেমে যায় ঘড়ির-কাঁটা।
ধান গাছের তন্দ্রায় পথ বাধা জমি—
অনেক চিন্তা ছড়িয়ে গেছে ধোঁয়ার মতো বাষ্পে,
এখন আর দেরি করতে নেই, করতে নেই
গঙ্গায় ডেকে গেছে বান, পদ্মা বয়ে গেছে
ধানসিড়ি নদীর মাঝিও গেছে। এখন,
ফসল চেয়ে খোলা মন—নতুন বীজ, নতুন চাষ
শুকনো ভূমি, ডাকছে দর্দুর—মুক্ত কথা, নতুন সুর।

রাঢ়ের মন্দির

ইঁটের পর ইঁট নিয়ে ওরা
টেরাকোটা করেছিল।
চারটি আর পাঁচটি যন্ত্র নিয়ে
অর্ধজীবন ভরে মন্দির গড়ে তুলেছিল, বিজনে।

চারদিকে কেঁউটেসাপের গা'টি যেন
ঠাণ্ডা কালো! জংলীকাঁটার ঝোপ-ঝাড়
নেবুতলা, আমবাগান একটু দূরে,
করমচার বুটিদার সবুজ শাড়ি
ছড়িয়ে গেছে পাকা দেহের ওপর।
শুধু ইঁটের পর ইঁট শ্যাওলা মাখা
টেরাকোটা-কাটা মন্দির দেয়াল।

হুঁকো হাতে গামছা পরে দাদু
শঙ্খিনী সাপের গর্তের অদূরে
ডিম কুড়োতে হাঁস তাড়িয়ে
ফিরেছিলেন বাড়ির দিকে।

শ্যামলী মেয়ের চোখে ঘুম নেই
ঝোপের পর ফাঁকা মাঠের দুপুরে
তাল নারিকেলের মাথায় সূর্য এসে বসেছিল।

মাঠের ওপারে বিন্দু বিন্দু কালো
পাল্কী দুলিয়ে বেহারারা সব মন্দিরমুখো।
মাঠের দক্ষিণ কোণে এক পংক্তি মানুষ,
পিঁপড়েরা—গাছের ওপরে ছুটছে।

তখনই, কালো দৈত্যেরা ওদিক থেকে
ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে, খাল-বিল ডিঙিয়ে
সবার ওপর গড়িয়ে ছোটে আর ছোটে—
মাঠের ওপর গৈরিক হিংস্রতা…
জল আর জল, লক্ষ লক্ষ অজগর
জল আর জলের আদিম গ্রাসের উৎস….

অনেক কাল গেছে তারপর
তুমি তো ছিলে প্লাবিত মন্দিরে বন্দী
শান্ত সাধনায় নির্জনে, নিরালায়।
এইখানে তুমি একদিন এসেছিলে
নতুন শাড়ি পরে
একমুঠো কোমর থেকে আঁচল টেনে
শূন্য বুকের চূড়া দুটো আলগোছে ঢেকে
খোঁপায় তোমার জবা আর হলদে সজনে ফুল-
তোমার চাবি বন্ধ মন্দিরের কোঠায়,
বাইরে ছিল ইঁটের ওপর টেরাকোটা।

অপেক্ষায়

বহুদিন কেটে যায়, তারপর
নতুন উদ্যত পন্থা নিয়ে।

অথচ আমার ছিল সবুজ কালো আঙিনা
আর বাঁকা বাঁশের তৈরি অভঙ্গুর দোচালা ঘর,
হাঁস মুর্গী আর পায়রার সংসার,

ঘরের ভেতরে কয়েকটি পুরোনো বাসন
কুলুঙ্গীতে পুরোনো বাক্স।

আমার ভেজা দিনের ছাতা
শুকনো দিনের পাটি
আর ঠাণ্ডা দিনের কাঁথা—সবই পরিপাটি,
খড়ের স্তূপ, ধানের গোলা, জলের হাঁড়িকুড়ি—
তোমারই সব ভেতরের আয়োজন।
ধান-কোটার টিনের চালা
তারপরে হেঁসেলের সুরু ও শেষ, এবং
জংলী বুনো শাকের গন্ধ
পানায় ভরা জলের কালো আর্শী
দশ পা দূরে বেড়ায়-ঘেরা ভাঙা দুর্গন্ধের ঘর
আর ওদিকে কুয়োর পাশে সোঁদা গন্ধ
কয়েকটি জবা ফুলের ঝাড়।

হাটের পথে সেদিন হেঁটে আসা নিয়ে সুরু
ওরা বলে আমাদের আর নেই খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ
কুরুক্ষেত্রের অন্তিম চিত্রের মত
অবসন্ন দেহ, নাকের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম,
কোথায় আরম্ভ, কোথায় শেষ, হাটের পথে যেন দেখা
ফসল ফলানোর অপেক্ষায়
আমাদের নাকি জন্ম!
মানুষমুখো মেঘের পেছনে সূর্যের নতুন রং
পাল্টানো বৈশাখের পর বৈশাখ।

শুধু পরদিন···আর অজ্ঞাত পরদিন
নতুন তাসের দেশ!

মৃত্তিকার অক্ষরে

দুদিকে জঙ্গলের সারি, আম্রকানন
মসজিদের পর ডাইনে বাঁয়ে ছোট ছোট পথ
মুর্শীদকুলীখাঁর মুর্শীদানগর—কাটারা।

কেল্লা-মসজিদের চতুষ্কোণ চত্বর
খিলানের ইঁটগুলো সব চেয়ে-থাকা
ভগ্নদেহে চিরচূর্ণীকৃত মসলার লেশশূন্য,
স্বহস্তে গড়া ইষ্টকদুর্গ—প্রথম ইঁটের মন।
খিলানের দাঁতে দাঁতে কঙ্কালের হাসি
অমোঘ অস্থির লগ্নতায় অস্থি শুধু
স্বহস্তে সযত্নে গড়া ইষ্টকদুর্গের ভাষা।

দুর্গের প্রথম সোপানশ্রেণী তলে
সমাহিত নিজদেহ কবরে।
মৃত্তিকার ভাষা বলে যায়—
অজ্ঞাত পথচারী
পদরজ দিয়ে যাবে বক্ষের সোপানে,
দিন পরে দিন পথিকের লাথি জমা হবে
সোপানের ঊর্ধ্বে, স্বর্গের সঞ্চয়।

বিনয়ের চিরস্বর্গে মুর্শীদাবৃত্তি
মৃত্তিকার অক্ষরে আজো অমেয় কবিতা।

পরমাণু

সেদিন সবুজের দরজা খুলে গেল
রঙীন আলোকে পোকা মাকড়েরা এল
সরীসৃপ, জানোয়ারেরা
তারপর মানুষ।
মানুষের 'পর কে?
চোখে অঞ্জন লাগে আজো,
স্পষ্ট দেখা গেল—ফুল, ফল, বনস্পতি!
অনেক দেখাদেখির পর
প্রচ্ছন্ন নীলিমাকে ভেদ করে বোধের মন্ত্রণা,
যখন যন্ত্রে চেরা আর আঁক কষা সুরু।

এখন নিঃসীম ওপারে দেখাদেখি
কিন্তু এর পর কি?

আমরা তখনো থামব না
সবুজের দরজা হয়ত বন্ধ হয়ে যাবে,
কোটী কোটী প্রেম, কোটী কোটী দেহ যাবে।
আরো নর, আরো নারী লগ্ন হবে,
শবের পাহাড় জমবে
তারপর কে?

যারাই থাক, তারাই থাকবে বারুদ।
সন্ধানের ক্লান্তিতে ভুলতে পারবে না কেউ
সবুজের দরজা খুলে এসেছিলাম আমরা
হাজার হাজার বছরেরও আগে।
তখন গোলাঘর থাকবে না। নৈবেদ্য নেই, পুকুর নেই,

নেই মন্দির, ফল, ফুল শুধু ছবি আর ছবি,
বন্ধ হয়ে যাবে সবুজের দরজা।

তখনো বিস্মৃত ঐতিহ্য নিয়ে
ধাতব শান্তিতে আমরা রইব ছড়িয়ে
পরমাণুর সৌর সৈকতে
চির অস্তিত্বের প্রস্তাবনায়।

হেমন্ত

এক ফোঁটা হিম ও একটুকু শেফালি,
দুয়ের বিবাহের নেমন্তন্ন।
নীল চন্দ্রাতপ এসে উঠোন আচ্ছাদন করল
তাই এই রোদের হাসি।

বিবাহ দিলুম দুয়ের—আমি পুরোহিত—
ভাষায় আকিঞ্চন তবু মন্ত্র পড়েছিলুম,
পাখীরা ছুটে পড়ল শস্য খেতে
ধানের গাড়ি ঘরমুখো হল,
সেদিন সভা হল হেমন্তের।

তারপর পরিচ্ছন্ন শুকনো দিনের পালা
শুধু সঞ্চয়ের হাঁড়ি নিয়ে ঘরমুখো সব।
পৃথিবীর মুদীখানায় হিসেবের
খাতা লেখা হল হিমের কালিতে—ধূলোর ওপর,
তখন নিশ্চিন্তে, রসিক-হেমন্তের হাসি।

নদী ক্ষীণ-স্রোতা হয়ে এল বুঝি,
রসিকতা ক'দিনের কথা ? বিশুষ্ক বারুদই জীবন
আর মিছে দেরি, কোথা গেল হাসি ?
নেড়া খেতগুলোতে চাষ—হাল্কা সবুজ রবি-শস্যে।

কিন্তু, তবু কোথা যায় হিম,
কোথায় ধানের আসর ? খরচের-খরা নিয়ে
কয়াশার পর্দাঘেরা আজ—অর্থহীন যাত্রা।

বসন্ত

বড় কৃপণ দিনগুলো—
সকাল সন্ধ্যায় শূন্য আকাশে,
পকেটে বাতুলতা, চোখের কোণে কালি।

অর্থাৎ পলাশের দীপ্তি আর রক্তাশোক
অর্থহীন হয়ে গেছে।
মাছি ভনভনে উঠোন, ধূলো উড়ছে,
চৈতির ঔদার্যে অবসন্ন
ফুলের বাসাতে মৃতের সঙ্গীরা সব,
রঙের অভিষেকে শাদা রোদের কচ-কচি।

লাউএর মাচায় ঝুলছে বুড়ো লাউ
বিলিতি বেগুন মাটিতে সঞ্চিত, যদিও
শুকনো শাক শস্পে পরিণত
ফুলের চেয়ে ফসলের যাত্রা পথ প্রশস্ত

লঙ্কার ফলনে কিছুটা বাঁচোয়া,
পোকার উৎপাতে আশার কোপ।

আজও এ বসন্তে মাধবীর দ্বিধা নেই,
ঘরের কোণে চাষীষোড়শীর
পাটের আঁটির মতো বাঁধা শক্ত কালো খোঁপা
তার ওপর জবা ফুল শুধু।

পুড়ে খাক হয় তামাটে কালো রূপ যাদের,
উষ্ণ বুকের ভেতর তাদের
তপ্ত যোজনার অনাড়ম্বর প্রক্ষেপ।
উদ্দাম সম্বিত ঘুরছে প্রসন্নতায়
নিরাশ্বাস জীবন পাত্রে—উচ্ছল আশা, শুধু আশা
সেইত বসন্ত — ভদ্রজনের এক সাধু-কথা।

৫

কাকেরা ডাকছে

ক্লান্তির পর ক্লান্তিও আছে
মাঠের বালিশে শিথিল শয়ান
ওড়ে, ওড়ে শুধু আশার কেতন
দুদিনের শেষে কাকেরা ডাকছে,
কৃষ্ণ বেদনা লুটোয় অঝরে
ঘুম ভেঙে যায়।
ভিক্ষায় এই দীক্ষা চাইনে
কাকেরা ডাকছে
আমার ক্ষতকে বিক্ষত করে শাদাটে কাকেরা

শাদাটে কাকেরা—
দূর থেকে শুনি—ডাকছে হাঁকছে

হলুদ মাটিতে সবুজ গানের
জলসায় জাগে কচি কাঁচা শীষ
দুলে ওঠে। তবু
এখনো কাকেরা ডাকছে।

শিশু ধান শীষ হাতছানি দেয়
এখনো অনেক সময় রয়েছে—
এখনো সবুজ হাসির কামনা,
কিন্তু সুদূরে কাকেরা ডাকছে।

পালা বদল

আজকে শুধু বদল আর বদল—পালা বদল
অথচ প্রাণটা যায় না বদলানো
বদলায় রূপ-কল্প—আজকের যা দাবী,
কিন্তু যা হাতে পাবার, তার নেই হদিস।
জীবন-প্রেমে যখন পুরোহিতের যজ্ঞ
তখন বিজ্ঞজনের কলতলাতে খুনশুড়ি।
বুদ্ধি যখন মনের যন্ত্রী, চরকায় তখন তেল নেই।
এবং বিজ্ঞানের তালতলার ভিড়ে—তাল পাকলেই শাল
যদিও এখন পালা বদল, ঢিলে সব বাঁধুনিটা
ক্ষয়ে যায় দিনের পাতা—চমকায় রক্তবীজ,

যখন ভাল করে বেঁচে-থাকার স্থস্মিত প্রশ্ন,
উত্তর ফস্কায় তারার মতো—বাঁচা বুঝি যায় না।
দিনের লাগ পাওয়া যায় যদিবা—আউশেও যা, পৌষেও তা
তবু বদলায় না জমিটা—উর্বরতায় অনুর্বর।

কোন এক মাঘের শান্তিনিকেতনে

চলো, এই হয়রানি থেকে দূরে।

ঠেলাঠেলির জংগল-কলকাতায়—
বড় বড় জন্তু জানোয়ারের চীৎকার,
সিং মেরে দেওয়া অথবা থাবায় মাংস ছিঁড়ে নেওয়া,-
মোটরের ওপর, কণ্ডূয়ন আর খাদ্যেষণা,
এবং কৃষ্টি-অন্বয়, সভা-সান্নিধ্যের ক্লান্তি,
ছায়াছবির গোহালে রসিক-বাছুরের কিউ,
পার্কের আলো-আঁধারি, আর
শব্দের প্যারাসুটে ঝোলাঝুলি সেরে গুহায় ফেরা,
কিন্তু, আজ ভাল লাগে না কর্মকাণ্ড।

চলো, বক-শুভ্র হয়ে নিস্তব্ধতার নিস্তরঙ্গে,
রমণীয় রিক্ততার শান্তি-সমীরে,
চড়াই উৎরাইএর চকিত চুম্বকে
রাঢ়ের তাম্ররেণু গলা দিন, ফেউটে কালো পথ,
সম্মতির কেতন-ওড়া ঝাকড়া-মাথা শাল-তাল
সবুজ কচি পাতা গায়ে গায়ে গায়ে,
পলাশের অশোকের রং ছিটানো ধুলোর ঘূর্ণী প্রান্তে

চৈত্রতুপুরের মাঘে-ফাল্গুনে হানা,
আর যদিও বা কখনো বর্ষার পরিক্রমণ শীতে।
নরম দেহে এক শক্ত আদিম বাকল পরে নাও।
এবার বেণীবন্ধে দুটো শাদা ফুল,
কাঁচুলির কলঙ্ক-বন্ধনমুক্ত নিঃশ্বাসে
মুক্ত পায়ে পল্লীতে পল্লীতে, অধ্যাপক সমীপে,
কথার শান্ত-সমীরণে—অতীত দিগন্তে—

ছাতিম তলার শীতল স্পর্শ—পাল্কী-দোলায় দুলছে।
ধ্যানমগ্ন মহা-ঋষি
প্রশান্তি তার এই স্বল্প পত্র-মৌলী তলে।
থাক তিনি।

চলো, দ্বিজেন্দ্র ঋষি সন্নিধানে
পাখী আর কাঠ-বেড়ালী 'অধ্যুষিত একাসনে
মধ্যাহ্ন-কৃত্য সমাপ্তির ঢং দেখে আসি।
থাক তিনি।

তারপর, রবীন্দ্র সকাশে বসে—সম্ভ্রমে মাথা নত করি
কল্পনা যুগের দুগ্ধদেহ মানব কবি
ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকে কঠিনের সাধনায়।
থাক তিনি!

বরং, যে সঞ্চিত কোষাগারে সারাটা দিনের যাতায়াত,
সেখানেই বেচে দিই কানটা ও প্রাণটা—
রবীন্দ্র-সংগীতে।

এর পর, গ্রাম প্রান্তে আচার্যের সঙ্গলাভ—
পণ্ডিত, সেবাব্রতী এবং বিদেশাগত-মনীষি,
সাহিত্য-শাস্ত্র-কলা-জনতাসেবার রাজপথে-গলিপথে।

সন্ধ্যার রং-হাঁড়ি ভাঙা গৈরিক আসরে
বঙ্কিম ভঙ্গী বাউলের একতারে, একসুরে
জীবন সন্ধ্যার গানে—
সংসারের অসারতা খসে পড়ে মানুষের জীবন-পাত্রে
মানুষই জমিটার সুন্দর সার হয়ে ওঠে।

অবশেষে পৌর্ণমাসী রাতে জ্যোৎস্না-কক্ষ থেকে—
খসে পড়ে তারা, শান্তির বরফ জমে স্তব্ধতায়।

কিন্তু, পূর্ব সীমানায় খাদ কেটে অদৃশ্য গতিতে রেলগাড়ি
ছুটে চলে কোলকাতায় রঙীন মনের সার্কাসে,
অথবা আস্তিন-গুটানো মানুষের তাড়না বিতাড়নে,
শান্ত হয়ে স্তব্ধ থেমে থাকা শেষ হতে চায়।
কারণ, আরো ক্লান্তি-অশান্তি ও উৎপীড়িত রোমাঞ্চের
মানবিক রোমহর্ষ চাই সংগ্রামী মানুষের—
যুক্তির পরাক্রমে, বিদ্যুৎস্পন্দনে, মালিন্যের মর্মস্থলে
অণুকণা ফিরে ফিরে ডাকে,
ফিরে চলো যাই, ফিরে চলো যাই।

কবি মোহিতলালকে উৎসর্গ

● কান্না ●

তুলো

কে আমায় হাতে তুলে দেবে
খামচিতে একটুকু তুলো ?
পাঁচ নং বাসে চড়ে গড়িয়ার রুটে
দোতলায় একেবারে সামনের সিটে
জনতার মধ্যেই নির্জন
পুরোপুরি একা।
চারদিকে সাদারোদ ঝিল্‌মিল করে পোকাগুলো
পোকার মতন দেখি মানুষ মানুষ
সম্মুখে পেছনে আরো ফুটপাতে স্টপে
চারদিকে, চারদিকে—ওপরে ও নীচে
মানুষের বৃষ্টিতে ভেসে গেছে পথঘাট,
তারই মধ্যে একা বসে ভিজা পাখি
দোতলা বাসের কোণে একখানি সিটে !

থাক সব, থাক সব চলুক না
বাধা নেই সকলের থেকে কোনো,
মুক্তির কথা নেই—জনতা-জীবন চলুক না।
পথের ওপাশে শুয়ে গলিত কুষ্ঠ হাত পাতে,
নিশান উড়ানো ক্ষুব্ধ সারি সারি রুক্ষ শ্রমিকেরা
এঞ্জিনে চমক লেগে, থমকে বাস,
গাড়ি আর গাড়ি আর কাটাকুটি ট্রামলাইন চলে।
পেছনের সিটে বসে স্কুল মাস্টার
সরবে সবকে বলে বিপক্ষে কর্তৃপক্ষের,
অথবা ওদিকে কথা না কথায় হাসে এক অফিসার,
কালো বাজারের ভাষা শোনা যায় অন্য কোণে,

ডাইনেতে আরো এক চাকরি রাখার পথ,
আরো দূরে বসে ছেঁড়া চাদরের তলা থেকে
মেয়ের বিয়ের গাল গল্প—
খুশি-অখুশির দুমুখেতে হতাশায় বঞ্চনায় জীবন-প্রকল্প।

আমি বসে আছি নির্জন
কে আমায় হাতে তুলে দেবে
খামচিতে একটুকু তুলো ?
বাসটিও মোড় ফিরে থেমে যায়
তারপর যাত্রীরা যায় এলোমেলো চলে
মনটাও বাদুড়ের মতো ঝাঁকে উড়ে চলে
বাদুড়-জীবন ঝোলে বাসে—থেমে থেমে পদে পদে।

দোতালার সমুখের সিটে ভীরু
জ্বলে গেছি আগুনের শীষে—
আমি নাকি কারো জন্যে কিছু করিনিকো
চারদিকে অভিযোগ অভিঘাত !
আমি কেন উজাড় করিনি যা আমার আছে
সকলের সুখের আলোকে আমি জ্বালাতেও পারিনিকো
একটি প্রদীপ শিখা—
স্থির হয়ে আছি একখানি ভিজা ম্লান সলতের মত।
এই দুপুরেও ঘন আঁধারের ছবি
দাহ্য হবার জন্যে অগ্রাহ্যতায় আমি আছি, থাকি ঠেকে।
অনেক ঝলক আর বন্ধ, ধ্বনি, ঝড়, অভিযোগে
কানের রন্ধ্রে ভরা-পাত্র ঢেকে দিতে
কে আমায় হাতে তুলে দিলে
খামচিতে একটুকু তুলো !

সুদূরের কান্না

কী অর্জন করেছ অক্লান্ত চেষ্টায়—
সেই কথাই বলতে এসেছ তো, সন্ধ্যার কুলায়ে ?
ডানার ঝাপটে রৌদ্রতাপ উড়িয়ে দিয়েছে
তরঙ্গের মত। দগ্ধ হওনি কখনোও বুঝি ?

কি তোমার শক্তি ডানায় দেখেছ জগত
আমি বসে আছি শুষ্ক নদী-কিনারায়—
স্তিমিত স্রোত—একটি সূতোর মত,
আমায় আর তোমায় বাঁধতে চেষ্টা করছে।

বিষণ্ণ সন্ধ্যা নেমে এসেছে, জীবন ধূসর
ক্লান্তি জানাতে পারবনা বুঝি, এরপর আর্তনাদ,
আমরা কি হিসেবের খাতাতে বাম থেকে একটু সরে এসেছি ?
জমা-খরচের কি যে অভিপ্রায় জীবনে ?
বেঁচে থাকো তোমরা আলোর আসরে
প্রাচুর্যে, পূর্ণতায়—অনেক সুখের সংসার
যে রয়েছে পড়ে মহান শক্তির আশ্বাসে
সে যে পতঙ্গের মত পুড়ে যায়, পোড়ে অগোচর।
জানাতে দাও শ্মশানের ঝিঁ-ঝিঁ ডাকের মত
অথবা প্রান্তরের আর্ত চিলের করুণ চিৎকার।
আমাদের কান্না কি তোমার মৌনকে আজো দ্বিখণ্ড করে নি ?
মৃত্যুর ডাক কি আপন বাঁশীতে বাজবে না ?

ভুল

একটি অথবা দুটো পাপ না নিয়েই এত হাসি
সহস্রে দেনা শুধেও হয় না নিশ্চিত
জীবনটা অখণ্ড পাওনা-দেনার চরকী
সে ঘুরছে আর ঘুরছে।

মেলার মধ্যে হিন্দোলার নতুন ঘূর্ণী
পাক দিচ্ছে একটি মহান চরকা
অথচ পথটা চলেছে সোজা।

জনস্রোতের পাড়ে একফালি ঈশ্বরের জমি
নীরবে উঠে বসে থাকা যায়।
কখনো ক্ষীণ ক্ষুরধার পথে থেমে যাওয়া চলে
একটুকু ভুলের তাগিদে হয়ত।

ভুলের ক্ষমা নেই
ভুলের কোনো ঈশ্বর নেই
হয়তো চমৎকারে কোন ভুল নেই
হয় তো বা যৌবনের ভুল নেই।
অনাবশ্যক বৃহতের ভুল।
শুধু আর্ত, বিচ্ছেদী, স্পন্দিত-আলোর ইতিহাস
কিন্তু, বৃহৎ অন্ধকার।

প্রক্ষেপ

সকালের কাঁচা রোদে
কান্নার ফুল জমবে না তা জানি।
পাঁকে ও বমিতে গড়ায় হাঁড়ির মানুষ
বহু সুখ-দৃপ্ত ইমারতের
অথবা ঝলমলে দোকানের আরো দূরে
বউবাজারের বহুজন্ম-অধ্যুষিত
পাথুরে ফুটপাতে মরেছে অজ্ঞাত মানুষ
সার্থক জন্মের একটি খরচ।

ওকে নিয়ে গান নয়
ওকে নিয়ে কবিতা নয়কোনোকক্ষণো
কারণ, আকস্মিক অপঘাতে এ মানুষ জন্মে
কারণ, এ মানুষ অনাবশ্যক প্রক্ষেপ।
ভেসে আসা শূন্য কথা—'অমৃতের পুত্র',
কারণ, ওরা অনায়াসে মরে পাঁকে ও বমিতে
পথে পথে হাঁড়িটির পাশে।
দোকানের আয়নায় মুখ দেখিনি কখনো,
দেখন-রীতিতে শুদ্ধ নয় পিতৃপিতামহের দান।

কিন্তু এমনি ধোঁয়ার মত
আমিও যাবার পথে অমনি যাব বুঝি,
পচাফল ঝরবে অকালে
সেখানেও প্রয়োগবিধির অপ্রয়োজন।

আমি যেন নিশ্চিন্ত বায়ুর বাহন
বেদনার বজ্র উদ্যত দেখি
শকুনিরা ফিরে ফিরে দেখে যায়
স্তম্ভিত আঁধারে পালিয়ে বেড়াই,
বজ্রাহত অঙ্গারের পথে—
আমারও ধরিত্রী ধূসর
অনবসর-ব্যর্থতার জীবাণুতে গড়া

মুহূর্তও ওকে দেখতে পারি নি,
ও তাই, প্রক্ষিপ্ত—প্রক্ষিপ্ত শুধু।

খবর

ভীষণ সুখের কথা
কোথায় নিবেদন, কা'কে করা যায় ?
টেলিগ্রামের অবকাশ নেই
কথার মোড়ক করে পাঠাতেই হবে।

সকালের গলিত রোদে শুরু—সাড়ে ন'টা,
জঞ্জালের পাশে নেড়ী কুকুরটির সঙ্গে
সেই ভিক্ষুকটি যে অবশিষ্ট-খাদ্য খোঁজে।

রাজপথে সহস্র জন
প্রাণপাত্রের খোঁজে এখানে ওখানে
সহসা লেনদেন এদিকে ওদিকে
সংজ্ঞাহীন অভ্যাসের তাড়না।

চৌমাথার মোড়ের কাছেই
সহস্র চক্রের শব্দ বক্রতায়,
অনিমিত্ত মুহূর্ত নিয়ে কারুর ভাবনা নেই।
কিন্তু ভিক্ষুকটা টুকরো টুকরো
জঞ্জালের কোণ থেকে এঁটো, পাত্রে জমায়
আর পেয়ে যায় নেড়ী কুকুরটাও—
এ ভীষণ সুন্দর খবরটার নিবেদন কোথায়?

নিরিখ

আমাদের মেরুদণ্ডে কবে
অস্ত্রোপচার হবে, আর কত দেরি?
উনিশ শতকের বেলা ধ্বসেছে ভারি হয়ে
বিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসার বিশশতকীয় আমেজ।

এধারে নারকেল গাছের মাথা বজ্রাহত, পড়ন্ত ডালে জ্বালা শুধু।
যত বড় রোগ, বৃহৎ তার ধ্বংস
এবং বৃথাই বৃথাই বৃহত্তর গ্রন্থ-প্রতিষেধকের সঙ্গে পাল্লা কষে
শুধু সাজ-সরঞ্জাম, পৃথিবী ছড়ানো হাসপাতাল
মৃত্যুময় বিচিত্র বিকার, বিকৃত যুদ্ধক্ষেত্র।

অথচ, এখন সবাই সকলকে বলে ফেলছে
'তোমাকে বাঁচাতে পারি আমি।'
অতঃপর সকলেরই যেন উৎকণ্ঠ স্বগতোক্তি—
কবে অস্ত্রোপচার, আর কত দেরি?

ওপারের ঝড়

সফেন ।হংস্র বিছানায়
জাহাজের নোঙরটানা বিশ্রাম
বৈশাখী পদ্মার ঈশান কোণে শোনা গেছে
হাড়গিলের পাখসাটে আসন্ন ঝড়ের স্তব্ধ পূর্বক্ষণ ।
এধারে নারকেল তালপাতা—
হাত বাঁকানো আঙুলের ডগা
যেন ইঙ্গিতে ওপারের আলোড়ন ।

তা বলে কি শুধু ঝড় চিরদিনের কথা,
গাভী মহিষের সঙ্গে মানুষও ভাসে অজস্র অর্বুদ ।
মাঠে ডুবো ধান সতেজ শীষের উপর জ্বলজ্বল্
পোষমানায় অন্ধরাত্রির আলেয়া,
পদ্মা-ধলেশ্বরীর অলিগলিতে, বানের জলে
এখন সোনা-মিঞার বাড়ি কতদূর ?

কয়েক কলসভরা গানের ভাষা
রসে সিক্ত ভাটিয়ালির আলপথ
হাটের মাঝে দোতারার অহঙ্কার ।
ধলেশ্বরী পাড়ে আড়িয়ল বিল
সোনা মিঞার বিবির জন্যে বন্ধুর দেশের নৌকা
নারায়ণগঞ্জ ওপার হতে শীতললক্ষা পার
তারপর মেঘনা, ওইপারে নবীনগর, দক্ষিণে চাঁদপুর

সুরগুলি ওড়ে দূর হাওয়ায় হাওয়ায়
এই ঝড়ের রঙে খোদার কেরামতি

এই বাসনার সোনা ফলে দরগায় চত্বরে
এই কথায় ঝড় চলেছে খালেবিলে
দীঘল দীঘল জলা মাঠের ভাবদরিয়ায়
তারপর "আইস বন্ধু, তামুক খাইয়া যাও।"
তারপর "আমার বাড়িত যাইওরে বন্ধু,
বসতে দিবাম্ পীড়া
জলপান করিতে দিবাম্ শালি ধানের চিড়া।"

এখন রমণায় আছে কি সেই বৈশাখের মেঘের বৈশাখী,
ঘূর্ণী ঝড়ের শীষে শীষে পায়রাগুলোর ডিগবাজি
এবং লাটাই-সুতোয় আটকে থাকা সোবান মিঞার ঘুড়ি।

এখন সব নতুনের কেশবিনুনী বাঁধনছাদন
এখন মনের মধ্যে কালো জাল বোনা—
এখন 'তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুব্যা মরি।"

সোনা বন্ধুর ডাক আসে ঝড়ের আগে
শুধুই খোদার ওপর খোদকারী
আব্বাসের খোলা গলার মজুতদারীর
শেষ নেই। তার বিস্তার খালি খালি বলে—
"আইস মোর হিয়ার কূলে।
দুঃখের কথা কইব নিরলে
সাগরে আগুন জ্বলে।"

কিন্তু তবু ওপারের ঝড়ের নেই নিস্তার
অগস্ত্য যাত্রার শেষ কই। আর কতদিন?

জীবন-গাথা

অনুপমা ! কে বলেছে তুমি রোগিনী
আশ্চর্য, আমাদের পৃথিবীতে রোগ তো নেই,
শরীরটা মধুরের মমতা,
আজকে তোমার শয়ন শুধু মোড় ফেরা।
মৃত্যু কখনো নয়, কারণ,
বিশ্বাস করি না ওতে, কেউ হয়ত করে
কেউ যাবে ওপারে, যাচ্ছে কেউ—
দিনের শেষে, অথবা লড়াই এর মাঠে,
কিন্তু কেন ? বাঁচার তাগিদে আর আশ্বাসে নয় কি ?
বাঁচার মহিমার মন্ত্রণায় আমি আছি
তুমিও আছো, রুগ্না নও। ভেঙে পড়া অকারণ
একটু শুধু ব্যতিক্রম—তোমার শিথান।
অনুপম জীবন-স্বপ্ন নিয়ে তুমি আমি,
আমার নাম "জীবন"। তুমি "অনুপমা"।
তোমার ঘরের জানালার পাশে সজনে ফুল
এখনো সদর দরজার পাশে রক্তজবা
এখনো সন্ধ্যামালতী আর বেলফুল আছে
তোমার খোঁপায় গুজে দেবার জন্যে।
ফুলগুলোর কথা মনে পড়ে না ?
কোমরটা বাঁকিয়ে দাঁড়ানো
কাপড় আটা মাংসল পেছনটাতে
চুলগুলো কাঁধবেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়েছিল।
কী চুল তোমার ! আশ্চর্য !
আমার দুহাত ডুবিয়ে ডুবিয়ে সীমানা পাইনি।

এখনো তোমার বুকের দুটো পাশে
সেই দুটো ফাঁপা মেঘখণ্ড পরিচ্ছন্ন আকাশে
অথবা, নির্জন রাত্রির এক পাশে
তোমার বাঁকানো বাঁকানো সাপের মতো
শরীরের মসৃণ প্রান্তগুলো কাঁধ থেকে পা
কোথাও যেন চোখ বিরাম পায় নি।
ঠোঁটের কচি কিশলয় দুটো এখনো লাল টুসটুসে
সে দুটো ছোঁয়ার আশে আশ্বাস এখনো
ঝলমলে চোখে চোখ রাখা আর
বেদনার আভা নিয়ে, জীবনে মুক্ত আকৃতি
রোগী হওয়া দরকার, ব্যথাও যে চাই,
কারণ, বেঁচে থাকা আশ্বাস তো শরীরের নয়,
শরীরটাকে মনেই রেখেছি ভাঁজ্‌পাট করে তুলে
বাঁচার জন্যে সযত্ন সাধন
অনুপমা তুমি যোগিনী যে নও।
জীবন বিশ্বাস করে না সে কথা
কারণ, যেদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকা
আশ্বাস শুধু এক শরীরে নয়—একটির নয়,
দুটো-দুটো রসির মত পাকিয়ে পাকিয়ে
দুমরে মুচড়ে দুটো শরীরের ক্লান্তি কামনায়
শেষ একটু আশ্বাস—একটু ভালবাসা,
তারপর চেয়ে থাকা—কথা আর কথা
আরো দিনের যাত্রা সুরু।
অনুপমা, তুমি রুগ্না নও।
রোগতো মানুষের মনের ভাষা নয়
শরীরের অতিপ্রাকৃত রূপ সে
তাকে আর জানতে চাই নে।

মনে করো—দিন যায়, দিন আসে
শুধু হাসির ফাঁকে ফাঁকে
দু'পাটি দাঁতের ছুরি যত অন্ধকার কেটে দেয়—
একটু চা নিয়ে আসা, অথবা রান্না,
এবং তখন এক ফাঁকে, আকস্মিক,
খেজুরের একটুকু রস চুরি করে নিয়ে
সে কি অশান্ত হাসির ইতিহাস।
তুমি রুগ্ন নও! বাঁচার আশা
তোমার আমার শরীরে বিদ্যুৎ-বাঁধন, তাই
তুমি আমার কানে কানে বলো
"জীবন, জীবন, জীবন, আঃ জীবন"।

এবার বুঝেছ তুমি রোগিনী নও?
তা বলে কি মৃত্যু নেই?
থাক না তাদের মত ডাক্তারে আর হাসপাতালে
অথবা লড়াইএর মাঠে, অথবা প্রতিহিংসায়
যেখানে মৃত্যু আছে—থাক
অনুদার নেড়া পাহাড়ের মতো
আমাদের বিস্তারে আমরা নদী কলরোল
অথবা শ্যামল মাঠের মত একান্ত।
তোমার ঠোঁটের কচি কিশলয় দুটো মেলে ধরো
বলো দেখি নাম করে 'জীবন, জীবন'।
জীবনই যে সত্য মুক্ত পৃথিবীতে, কারণ,
রোগ সত্য নয়, বেঁচে থাকা সত্য, ক্ষুধা সত্য
পান সত্য, আশা সত্য বেঁচে থাকার আশ্বাসে—
দিনের পরে দিন গড়িয়ে চলে,
এ সত্য আরো একটি সূর্যালোকে

আরো চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে, অথবা
অন্ধকারে এবং একটি ঘরের আলোকিত নির্জনে
মনে পড়ে একদিন উত্তপ্ত দুপুর
রৌদ্রক্লান্ত পৃথিবীর জীব-জন্তু পুড়ছে
আমরা সহজ অগ্নিদগ্ধ
শরীরের হ্রদে নেমে স্নান করেছি প্রচুর
পাহাড়ে ঘেরা শান্ত বিস্তৃত হ্রদে
সে কি অশান্ত খুশির স্নান !

সে দিনের হাসি আজো মুখে চমকায়
কারণ একই মুখের আকাশে মেঘেরা আসে
আমরা আজো এত কাছাকাছি তুমি রুগ্না নও
বলো তুমি—জীবন, জীবন, জীবন।
মনে পড়ে শীত রাত্রি, মুক্ত অঙ্গ-লগ্ন
শরীরের আগুনে প্রতপ্ত তনু
জীবনের অর্থ মুহূর্তেই পরিব্যাপ্ত।
মনের নিকেতনে আমরা নীরোগ
অনুপমা, তুমি রুগ্না নও—
সেখানে আমরা বসে থাকি ভালবেসে
রাত্রি দিন মুখোমুখি চোখে চোখে,
ওপারের কুৎসা গেয়ে লাভ কি ?

এপারের জয়ধ্বান কার
তোমার নরম শরীরের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে
আমি বাস করি আমি জীবন
নাম ধরে বলো তুমি "জীবন, জীবন"
আমি বলি অনুপমা !

নীলক্ষেত

[মোহিতলাল মজুমদারের বাসগৃহে অসংখ্য বিকেল ও সন্ধ্যা

নীল ক্ষেত—নীল নয়, ক্ষেতও নয়
সবুজ মাঠের পাড়ে একতলা বাড়ি
গোলাপের চাষে অপরাহ্নের মানসিকতা
সব'রং দেহের দেহলীতে বাঁধা।
পৌরুষ প্রতীক নিয়ে মননের কোঠায়
জমাট।   আসরে নাদির, কালাপাহাড়—
চাবুক আর তলোয়ার,
তলোয়ারে লেখা কালো চিন্তা—অজা কাঁপে
ভাষার তরঙ্গে তীব্র আলোক-মশাল
অন্ধকার পদ্মাবক্ষে—মনীষার মমতা।
বঙ্কিমের স্বপ্নরাজ্য—
হিমবাহ নেমে আসে কল্পহিমগিরি থেকে
জীবনেই গলে যাওয়া অগম্য নদীপথ
আবিষ্কারে, আবিষ্কারে, আবিষ্কারে শুধু

শ্রীমধু-স্বপ্নে প্রাণচিতা জ্বলে,
অঙ্গারের মধ্যে থেকে হীরায় চমক
ধোঁয়াটে দমকা হাওয়া—ভাষায় লোপাট
আবিষ্কারে, আবিষ্কারে আবিষ্কারে শুধু

দিন আসে দিন যায় সারস্বত মন্ত্রণায়
অঘোষিত বাণীময় একটি একটি পর্দা খসে।

কথার শরীর গলে ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর রসে।
আরক্ত রূপের নেশা অতনুর তনুতীর্থে,
"দেহেরি মাঝারে দেহাতীত ক্রন্দন সংগীত"—
"এখনো যেটুকু রয়েছে সময় লই মোরা ভালবেসে।"

দুটো চোখ কষে কষে আলোর সমুখে
যুক্তিতর্কাতীত রাত্রির পর রাত্রি।

নীলক্ষেত মুছে গেল
এখন কে জানে কোন্ রমণীয় সেই ক্ষেত?
অজগর শুকিয়ে শুকিয়ে
গাঙ্গেয় তান্ত্রিক তাপে জ্বলে যায়, দগ্ধ হয়
দিন গত হয়—আজো কেউ কেউ পোড়ে বিদগ্ধের আঁচে-
নীল নয়, ক্ষেত নয়—রমণার নীলক্ষেতে।

কবি জীবনানন্দকে উৎসর্গ

● গতি ●

আরো দূরে

নৌকো ঠেকল একটি দ্বীপের বন্দরে।
বড় সুখে সবাই খাটে আর খায়
সমান অন্ন পানীয়ে সমান ইচ্ছে ও রসনার বিস্তার
সমান সস্নেহ যতন, সমান প্রয়োজন
সুখ দুখের দাঁড়ি টানা যায়।
যাঞ্চা নেই, এষণা নেই, শুধুই উৎকণ্ঠা
একীভূত এক বন্দরে প্রাপ্তির কামনা,
সূত্র থেকে সূত্রে এসে বঞ্চনায় প্রবঞ্চিত নয় কেউ।

দিন সমাপন, রাত্রি গেল, মাস গেল, বর্ষ গেল
দ্বীপময় জীবন।

অক্ষরেখা পেরোয় সূর্য, ঝাঁক বেঁধে আসে পাখি
আবার উড়ে চলে যায় মৌসুমী কালো মেঘ।
আরো প্রাণ আরো মন ওপারেতে বেগের মাথায়—
উত্তরণ সীমা ছেড়ে আরো দ্রুত নব-উত্তরণ।

জল-পায়রা নেমে এসে কথা বলে অবিরাম
ওপারে ঝড়ের সাথে বিসর্পিল বৃষ্টি অন্ধকার
ভাসায় জমি-জলা-জীবন-যৌবন আরো যা কিছু
আঘাতের আশ্চর্য আর্তি—সেজন্যেই শুধু।
দ্বীপের সুখের কারাগারে যেন অকস্মাৎ
বাসা বাঁধে মন, অস্বস্তির ডানা ঝাপটায়,
ছুটে যেতে চায় আরো দূরে—আরো মুক্তি খোঁজে—
আরো দূরে, আরো দ্রুত, আরো মুক্তি।

১

গলির খবর আজও হরপ্পার কালিতে বিগলিত!
ফেরিওলা ঝুড়ি নামায় রকে
আর ব্যাগউলী তরুণীর চুম্বক চাহনি-মুগ্ধ—
রকবাজেরা তেলেভাজা চিবোয় চা-এর সঙ্গে।
তখন, পাশে বসে দাড়িওলা কামায় দাড়ি।
বন্ধুদের আলিঙ্গনে
দুটো কলম পকেট থেকে বেরোয় অর্ধেক গোপনে
ন্যায্য-মূল্য দোকানের কিউ আঁকাবাঁকা
চাঁদার জন্যে স্বামীজী দুজন থমকে দাঁড়ান—
কয়েকটি হাড়ে লগ্ন মাংসল খাড়া শরীরে
নলকূপের পাশে উন্মুক্ত স্নান, ডাস্টবিনের ধারে—
অর্ধ উলঙ্গ নর ও বালতিময়ী নারী
দুজনায় জলের ভাগাভাগি হাঁকা-হাঁকি।

অতঃপর, সহস্র অধিবাসীর কামনা—শতবর্ষ আয়ু।

২

ভাবি, সব পরিচ্ছন্ন হোক,
মন হোক বিশোধিত, এবং
রৌদ্র-ধৌতদিনে দেয়ালটা চুণ ধোয়া।
বইগুলো ধুলোহীন—খণ্ড খণ্ড নীলাভ্র
বসন বিধবা হোক।

তকতকে পথ বিষ্ঠাহীন,
কুকুরীর স্নেহ থাক ছানাতেই চর্যারত।
সংস্থা-হারা নাগরিক সাফ করে ডাষ্টবিন
বিড়ালের পচা শবে শোক নেই।
জঞ্জালের পাশে কাক দেখা যায়
পাগলটা পচা ফেন চেটে চেটে খায়—
এঁটোকাঁটা আরো। মুগ্ধ মাছি
কুষ্ঠ গলা দেহে সুসঙ্গের ছোঁয়া পায়।
আমি আজ গলি-কলকাতার মগ্‌ডালের্‌ শাখায়-
অতঃপর যুগের আশীষ—শতবর্ষ আয়ু।

অপরাগতি

উড়ে গেছে, ঝরে গেছে ক্লান্ত সন্ধ্যায়
বৈরাগী হয়েছে বর্ষা!

এবার শ্যামলী মেয়ের চোখে ঘুম নেই
নড়ে উঠে খোঁচা দেয়—"বের'ও, বের'ও
বাঁধা ছাঁদা করো পরিপাটি।"
—মুখোস টেনে ছুঁড়ে দেয় জোয়ারে জলে।

আবার চিলেরা ডাকবে
আবার তুলোর বিছানা বিছিয়ে নীল বালিকা
ভাসতে ভাসতে রওনা দেবে দুদণ্ড পরে।

নীল মেয়ের সঙ্গে কেন দৃষ্টি বিনিময়
মুক্তি নেই বাইরের উঠোনে, আচ্ছাদন-কাতর সবাহ
মুক্তি নেই এ সমুদ্র-জল-বুদ্বুদের
শরীরের তীরে জমে যাবে লবণাক্ত রক্ত।

এমন সবুজ দিন এমন নীলাভ দুপুর
মিষ্টি রূপসজ্জা নিয়ে এল নায়িকা
খোঁপা খুলে, অলিন্দের আড়ালে বাঁধা ভেতর বাহির
বন ছেড়ে আরো বিজনে
নয়ন-কর্ষণ কপোলের খোলা পাত্রে,
অথবা স্বচ্ছ স্তনিত, নরম আশ্বাসে
শম্বুকের মতো গড়ানো গতি।

সময়ের তাড়া, অথচ
ও দিকে আজ্ঞাবহ মরণ এগিয়ে রক্তের পতাকা/
টানাটানি করে দেহ—
শকুনেরা সবুজ বনাঞ্চলে মৃত জন্তু নিয়ে।
জনারণ্যে পথ আমাদের দুর্গম তবু,
আশ্বিনের শ্লথ মেঘে এখনো যাত্রীর হৃৎপিণ্ড দোলে।

নতুন পথে

নিকানো আকাশে তিনটি রঙের প্রতিমা লক্ষ্য
তস্‌বিরে তুমি তাহারে রচনা করো
বাহির আলোতে পূর্ণ জীবনকক্ষ
তবু হীরামণি তুলে ধরো।

অনেক আশার আশ্বাসে যাঁরা দিলেন প্রাণ
তাঁরা জানেনাকো কখন মুক্তি পেলে
বেদনার বাধা ভেঙেই পেয়েছো ত্রাণ
দৈন্যেরে যাও অবহেলে।

যে যাবার গেছে ফিরেও অনেকে এসেছে পথে
বুনো আর মেঠো ফুল চারিদিকে থাকে
রওনা হয়েছে ভাবনার জয়রথে
তরোবারি আজ ছবি আঁকে।

মাথার সিঁথিতে বিদ্যুৎ ও মেঘ। ধানের ক্ষেতে
একহাঁটু জল। বকের উহিনী ওড়ে।
সবাই রেখেছে আশার পাত্র পেতে
ঋদ্ধি কখন আসে তোড়ে।

ছোট ছোট দ্বীপ ছোট ছোট তরী প্রবাহে ভাসে
তরঙ্গহীন যাত্রা নয়কো কভু
নির্জন বুকে রক্ত কাঁপছে ত্রাসে
গতিময় মন চলে তবু।

আজ তুমি নও দুঃসাহসীর বিজয়রত্ন
ঘরে ছোট ছোট কাজের আগুন জ্বলে
পথঘাট আজ নয়কো নিঃসপত্ন
যাত্রা সৃষ্টি নব ছলে।

দপ্তর ও ঘর

যদিও করণিক-হুতাশনে আমি গেছি জলাঞ্জলি
গুচ্ছে গুচ্ছে কর্ম-বন্দী ফাইল, দক্ষের উদ্যোগে
খাদ্য-গৃহ-বস্ত্র, কৃষি-কর্ম-কাণ্ড কথা
স্তরে স্তরে স্তূপীকৃত সময়ের কোণে,
তবু সবার প্রলাপ অমায়িক গালির কালিমায়।
দপ্তর ও ঘর এবং ঘর ও দপ্তর।

নিয়মের নিয়ন্ত্রণ-যজ্ঞে সমিধ হয়েছে প্রাণ
নায়ক ভুলেছে পথ, তানপুরাটায় জমেছে ধূলো,
বৈরাগী হয়েছে রাগ, যৌবনের শিবিরে চুরি।/

কিন্তু তবুতো প্রত্যয়ের তীরে
কোমল মাংসল আশা অবসন্ন অবসরে
সঞ্চিত চর্মে রোমে একান্ত-স্পন্দিত রাত্রির প্রবন্ধ।

গ্লানি সব ম্লান হয়ে যায় জীবন্ত ছোঁয়ায়
বুদ্ধির চশমাটা খাপে বন্দী চোখস্পর্শ পায়
জ্যোৎস্না নামে ঠোঁটের সোপানে
বক্ষ, শরীর সব ধ্বসে যায় গলে যায়
মাংসের চূড়া থেকে কাগজের কূপে
রন্ধ্রে-রন্ধ্রে-বিস্তারিত প্রতিদিন,
নিয়মের দূরে ফল্গু-গতি নরম, সহজ আশা।

এরপর এসো নীলকণ্ঠ বিষ কত আছে, কত রোগ,
অভাবের আগুন, কত জ্বালা, কত মৃত্যু-যাত্রা।

যাত্রী

১

সিমেণ্টের বাড়িগুলি, পুরানো দালান
তেড়ে আসে আমাকে তাড়ায় হাওড়ায়
দোকানীরা তাড়া দেয় বড় দীনতায়
ছেড়ে দিতে অনুরোধ, খুঁজি পরিত্রাণ।
আজ কিন্তু সকালের খাদ্যের সন্ধান
দুপুরে বাদুড় আর সন্ধ্যার সীমায়
জনতা ঝাড়র থেকে টেনে নিয়ে যায়—
নীড় রচনায়, হাওড়ার লৌহ চক্রযান।
ছুটে চলি, চোখ যায় তাল নারিকেলে
নব ধারাপ্লুত সবুজের দোতলায়।
উত্তীর্ণ চূড়াতে কথা সকালে বিকেলে
আড়ম্বরে বাসা বাঁধে রঙের শাখায়,
আরো বহু দূরে নিয়ে চলে যায় ঠেলে
একালে শস্যের ক্ষেতে বড় অসহায়।

২

হিসেব নিকেশ আমি দেখি বিস্তারিত
সাপ্তাহিক মাসিকের পাতায় পাতায়।
কবিতার খোলা খাতা বেদনা নাড়ায়—
ঠেলে দেয় পথে—পথ শব্দ চূর্ণীকৃত।

আচ্ছা, এত দ্রুত পায়ে চলে যাব কেন ?
নেই কেন মিষ্টিমৃদু শ্লথ পদধ্বনি ?
কবির খড়ম নেই, শব্দ কেন গণি ?
পায়ে চলা পথ ছিল—স্বপ্ন লক্ষ্য যেন।
সেদিন ফুটত ফুল, আর প্রজাপতি
স্তম্ভিত দেহের অনু রেণুতে হারাতো
কি হল যে আজ—তাড়ানো তাগিদে গতি।
পাখির মতন জালে পড়া যায় না তো।
রূপসী জীবনে আর কভু নয় নতি
গতি, গতি, গতি—আর দেরি নয়। দ্রুত।

ময়দান

প্রতিদিনের দেখা—তবুও এ প্রাথমিক বই কি ?
গলি কলিকাতার কিনারায়,
গোখুরো কালো সরু, ফ্রেমে আঁটা প্রান্তরিক প্রাণ
ঘাসের গোড়ায় দানবের দেহভস্ম। তার ওপর
সবুজ কিংখাব বিছানো আসর,
বিদেশিনী দুটো পায়ে ঠক্ ঠক্ করে হাঁসের গতিতে
মাড়িয়ে, মাড়িয়ে, মাড়িয়ে—চোখে আকাশের প্রতিবিম্ব
এবং আমাদের তরুণীর ঠোঁটে নয়া-কিশলয়
ওরাও আসরে এসে বসে—আনাচে কানাচে।
এ শতকের মিতালীতে চকিত ফিস্ ফিস্
দক্ষিণের হাওয়া, সমুদ্র-স্পন্দন, অথবা
বর্ষার ধারা নেমে আসা অপরাহ্ণ—

তখন ক্রীড়া-অসমাপ্ত প্রতিদিন
সহস্রের উল্লাসের কোলাহলে তাপদগ্ধ।
ইঁটের কালান্ত ছুঁই ছুঁই করেও করেনি গড়ের মাঠ, কিন্তু
এ শতকে আমরা এখন জনান্তিকে নই
এখন আমরা দৃশ্যপটে মঞ্চ-মর্মীতায় মগ্ন।
রহস্যের মুখোমুখি রেডরোড় থেকে দেখা—
নেতৃত্বের বাণী নিয়ে ধূলি কণা ওড়ে, ওড়ে, ওড়ে
হত্যার আহত বিক্ষোভ হুঙ্কারে জানায়
ট্রাম-মোটরের একপাশে উলঙ্গ লোকটার মত।
মনুমেণ্ট নয়—ওখানে চঞ্চল কম্পন,
মৃত্যু-কান্না-হাসি-ব্যথা
জনতার জমাখরচের খোলা খাতা।
অথবা রং বদলায়, আর বদলায় দিন লিপি—
কত প্রলাপের অনুলেখ, দগ্ধতার আস্তরণ।

ক্ষুদ্রের-জোয়ার

জোয়ারের মুখে অনেকে, অনেকে
ডুবেই চলেছে, ডুবেই চলেছে, ডুবেই চলেছে।
শুকনো ডাঙার দূর সীমানায়
সুখী জানোয়ার দেখছে, নতুন জোয়ারে—
ক্ষুদ্রের এক ডুব-সাঁতারের চলা
জোয়ারেই বয়ে সাগরটা এল ডাঙার ভেতরে—
পঞ্চাশ কোটি বছর খৃষ্টপ্রাকে। প্যালিওজোইক যুগ-

শতপাদ আর সহস্রপাদ, বৃশ্চিক, মাকড়সা
আর প্রজাপতি উড়ে উড়ে খোঁজে বনানী বনস্পতি,
শুষ্ক জমিতে দীর্ঘদেহের সরীসৃপেরা
দশ কোটি প্রায় বছর গড়িয়ে—হামাগুড়ি শুধু দেয়
ক্ষয়ে চলে যায়, মিশে মিশে যায়—ডাঙার কাদায়।

ফার্ণ, হর্স্‌টেল আর মস্—
মহীরুহ জাগে—ফলহীন, ফুলহীন
অঙ্গারী-ভবনে রসায়নে।
অতিকায় সব সরীসৃপেরা গ্রাস করে ছোট প্রাণ
ক্ষুদ্রের এক সর্বনাশার জোয়ারে।

মনের সূর্য এল পাটে।
নিঃশেষ হল ডাইনোসর,
পাখিদের সুরু ডানার ঝাপটে,
স্তন্যপায়ীরা জীবদেহে আনে স্তনমূর্তির কোমলতা,
রক্ত-জোয়ারে আগে আগে থাকে—কুকুরের অবতার,
উট-ঘোড়া আর নেকড়ে-ভালুক
হাতী-জলহাতী। গরিলার সুগঠনে
গতিময় শুধু মনের জোয়ার।

উত্তর-দেশী বরফেরা চলে দক্ষিণ পৃথিবীতে
প্রাণস্রোতে ভেসে। তখন জীবেরা
পাথর কুড়োয় পাখী ধরে খায়
আর শুধু ভাবে—
"পশুদের বশ করা যায় কোন কৌশলে?"

খৃষ্টপ্রাক পঞ্চলক্ষ বছরের সুরুতে
ভেসে আসা আরো ছোট-খাট রূপ
রুদ্ধ চেতনা কণিকা পুঞ্জে
স্ফুরিত যাত্রা—ঢেউএর মতন।

আবাদের সূচনায়
যৌথ মনের বিকাশ-বিষাণ বাজে।
আত্মরক্ষা যুদ্ধে বৃহৎ ক্লান্ত আক্রমণে।
সভ্যতাবীজ যারা বুনেছিল
ওরা গড়ে ওঠে, আবার ঘুমায় চিরদিন ওরা
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতার কুটিরে, গুহায় গুহায়।

তারপর ছবি, ছবিময়-স্মৃতি, ভরী থেকে তরা,
সুমহান এক প্রাণের যাত্রা আদিমের।
কতো শত শত বিরাটের মহা অহংকার
ক্ষুদ্রের মহা উৎসবে থাকে চিহ্নরূপী।
বৃহতের সব স্পর্দ্ধা
নিষ্পেষিত, চূর্ণ, দীর্ণ।
ভাবনা-জোয়ারে দানব-মনের, নতুন চংক্রমণ, কিন্তু
রেণুকণা থাকে ক্ষুদ্রের যাত্রার
পরিব্যাপ্ত জোয়ারের চেতনায়।

পাথুরে স্পন্দন

দগ্ধ হয়ে গেছে সূর্যদেব
রথ চক্র স্তব্ধ।

রক্ত স্তম্ভিত নয়
প্রাণোচ্ছল নর-নারী
মাংসল রৌদ্রের মুক্তি
ওপারের রহস্য-বিহীন নায়ক-নায়িকা।

উর্বশীরা অজ্ঞাত নয়,
অথবা মেনকা স্পর্শে
বশিষ্টের চিরন্তন অগ্নিস্রোত.
অনন্ত মিথুন সমুদ্রের একটি গণ্ডূষে
দীপ্ত থেকে উদ্দীপ্ত, তৃপ্তি থেকে অতৃপ্ত দৃষ্টি-ময়

পাথরের সূচীকর্মে
জীবস্বপ্ন স্তনিত স্তম্ভনে
মুহূর্ত স্পন্দনে—চিরন্তন, ক্লান্তি হীন।

প্রবেশ পথের সঙ্গীত জলসায়
উৎসারিত সহজ সুরেলা আলো
কোমল উচ্ছল, কোণারক : তারপর,
ক্ষয়ে যায়, ঝরে যায়, পুড়ে যায়
জীব-স্বপ্ন তবুতো।

মিথুনের দুর্বার সময় সমুদ্রে
নিয়ে যাবে বহুদূরে নারী-মাংস, নর-শ্বাস যতদিন।
দেহরশ্মি সীমানায়
পুড়ে যাক
তবু তার অস্তিত্বের মেনে নাও
গ্রাহ্য করো আদিম জীবনের সূর্য যাত্রা
নিরুদ্দেশ স্পন্দিত ভবিষ্যে

সাময়িক

আর একটি সপ্তাহ গেল—অক্ষয় জীবনের এক পাতা,
কূর্মের মতো পাগুটোয় সময়
অসম্বৃত সহিষ্ণুতার আঁচড় রেখে যায়।
কিন্তু খুঁজি অক্ষয় জীবন, কোথায় সে অধিকার?

অনেক বিনয় সূত্র মুখস্থ করা এবং
মুকুটের তাড়না, সম্মানের ধ্বজা—
প্রতিদিনের সাধারণ পথে
বয়ে চলা বহুঘাত অধ্যুষিত পথে। আরো যাত্রা—
কথা থেকে কথার প্রতীকে
ভাষা থেকে প্রকাশ রীতিতে
চিত্র থেকে আর চিত্রে, চুম্বন থেকে গভীরে
মেঘ বিদ্যুৎ থেকে অভ্রভেদী দালানের ছাদে
খোলা মাঠ থেকে অরণ্যে গহনে

নদী থেকে সমুদ্রে, মোহনা থেকে বন্দরে,
সমাজে, জনতায় অথবা কফিঘরের পথে
অশ্বারোহী-বেগে।

কিন্তু এখনো কলকাতার নাড়ি-ধমনীতে
জীবাণুর মতো মানুষেরা
হারজিত গুঁড়িয়ে গিয়ে একাকার,
যেখানে বিচ্ছুর লেজের কাঁটা গজায়
ডাষ্টবিনের গন্ধে পাক হয় পরমাণু
অস্বস্তির কত নিঃশ্বাস, নিরোধ, হত্যা,
ছিন্তাই, আত্মঘাত, অপঘাত আর হতাশার পালা
সময় সমুদ্রে ঢেউ চূর্ণ-বিচূর্ণ
গুঁড়ো গুঁড়ো বালির ভেতরে,
কিন্তু তবু, অক্ষয় জীবনের পাতা উল্টে
সময়ের বুকে থেকে যেতে চাই।

কোথায় সে নিঃশ্বাস পাওয়া যায়
পুরোপুরি মানুষের মতো ?
থাক ওরা ইমারতের আলোয় আলোয়—
ঝলমলে সওদাগরী মন
দিল্লী, লণ্ডণ, রোম, বার্লিন, মস্কো, টোকিও,
কিন্তু, সময় এখানে যে ধীর—
কচ্ছপটা পা'গুটোয়।

ছাড়ান দিলাম কোঠাবাড়ি, ফুটপাত, এবার
ডেলি ট্রেণ থেকে ছাতা হাতে নেমে

স্টেসন পার হয়ে বট-পাকুরের তলা দিয়ে
ষষ্ঠী-ঠাকুরুণের বাড়ির দিকে যাওয়া আসা।
জারুলগাছের তলায় ওরা তামাক টানে
আম কাঁঠালের আশা রাখে, আর—
এদিকে দশটা বেগুনের চারা,
ওদিকে মরিচ, মাচার লাউএর নরম ছায়া,
মাটি কুপিয়ে কুপিয়ে মসলা তৈরি
জড়ো করা—সার, বীজ—আরো আরো—
ধানের প্রদর্শনী মাঠের ওপর
প্রবীণ গৃহস্থের সামসাময়িক দিনগুলি।
কোথায় তার চিরদিনের পৃথিবী ?
এ যাত্রা কেটে গেল বুঝি কোন মতে !

কিন্তু আরো যেতে চাই, আরো দূরে
যেখানে আমরা অব্যয়—
আশা-আশ্বাসে। কোনদিন থাকব না
ভাবতেও পারি নে, কেউ ভাবে না।
খুঁজি অক্ষয় জীবন, কোথায় সে অধিকার ?

আর একটি সপ্তাহ যায়।

সে

রূপসীর পায়ে পায়ে শুনতে এলাম
একটি গাঁয়ের কাছাকাছি,
হিজল গাছের তলায়—শ্যামার নরম গান।
ভাঁটফুল-ঘুঙুর পায়ে বেহুলা,
লখীন্দর কোথায় যে গেছে
ফণীমনসার ঝোপ পেরিয়ে, সুন্দরী-গাছের অদূর সমুদ্রে।

যাক, নির্জন সম্রাট বসেছেন ঘরের কোণে
বোধ হয়, বাক্স তোরঙের পরে, টেবিল-লাইটের আলোতে
—ধানসিড়ি-মন নিয়ে ভিজা গাঙচিল।
কলম ঠুকছেন আলিবাবার গচ্ছিত রত্নশালার কবাটে।
আজ হেমন্ত গেছে ফুরায়ে, প্রতিশ্রুতি জলাঞ্জলি,
ঢের স্মরণীয় কাজ শেষ হয়ে গেছে,
শিল্প কিংবা সাধনা নিয়ে
শকুন, শেয়ালও পড়ে আছে, তবুও তবুও বুঝেছি।
বুঝেছি, অনন্ত প্রেম নিয়ে নয়
নক্ষত্রের বাগীশ্বরী দ্যোতনার থেকে ঝরে পড়া—
মুহূর্ত্তের ভালবাসা থেকে গেছে, আছে।
অথবা, নষ্ট নাসপাতি মুখ নিয়ে আমরা
এই জীবনের চৈত্র দীপ্তিতে—বহু দূরে
প্রশান্ত মহাসাগরের নাবিক দেখছি
এ পথে ফেরে না সে।

বই বেরয়, নাটক ছেপে বেরয়। খর্বাকৃতি, লাজুক মিষ্টভাষী—কোলাহল থেকে পালিয়ে ফেরেন।

ঢাকা-জেলার উত্তর পূর্ব অঞ্চলের একটি গ্রাম—শিমুলিয়া।

প্রায় পঞ্চাশ বছরে হিন্দু-মুসলমান (পাকিস্থানেও) ছাত্রদের সাহিত্য দীক্ষা দিয়ে আজ সপ্ততি বর্ষ অতিক্রান্ত।

ভাগীরথীর পশ্চিম তীর থেকে এখনো জানাচ্ছেন বহু বছরের কবিতা ও সাহিত্য রচনার বেদনা—ইনি শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর।

শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর
শ্রদ্ধাস্পদেষু

● বারুদ ●

মাঠের পারে

কলমের নিব দিয়ে মাঠ খুঁচিয়ে ধান বের করবো,
উপায় হবে কি ? সবুজ পাতার ওপর হলুদ,
তার ওপর তপ্ত চোখটা বসিয়ে কেউ ভাবে
এখন উপায় কি ? ও যে ধক্ ধক্ করে জ্বলছে।

আকাশের কালো হরিণ শুধু উঁকি মেরে যায়
দেখে যায়—ছন্নছাড়া বাউল একতারা বাজায় আর নাচে।
গঞ্জের হাট। দুটো তালগাছ সিং নাড়া দিয়ে
শূন্য মাঠে গরু-ছাগলের সঙ্গে মনটা বেচবে।

এই তো সুযোগ। কথার পাতায় রঙীন সওদা
আর হাল্কা তৈরি খাদ্য—কিন্তু কিনবে কে ?
চাষী আর বাউলে প্রার্থনায় বসেছে, গাইছে—
—এমন দিন কি চিরকাল থাকবে ? না, দুখ কেটে যাবে ?

আকাশের হরিণ পালিয়ে যায় চোখটা ধক্ ধক্ করে জ্বলে
দূরের কাটা খালে ঝির ঝিরে জল। উপায় একদিন হবে

স্পন্দন

ঠুকেছি চকমকি চোখের আড়ালে
বুকেতে সর্পিল দেখেছি গর্ব ·
ছুঁয়েছি জাফ্‌রানী ঠোঁটের ভণিতা—,

কিন্তু নিরাশায় বেঁচেই থাকা যায়
যেমন বরফের দেশের কার্ণিশে
বরফ মোম হয়ে আলোকে ঝল্‌কায়.

তেমন ঝলকানি বাঁধার সূত্রে
ঝোলান প্রাণমন ফ্যাকাশে পৃথিবী
তবুও আফশোষ কিছুই নেইবো।,

অনেক স্পন্দন বাতাসে গিয়েছে
অনেক রাগিণীর করুণ যাত্রা
বিফল হয়ে গেছে আশার ইশারায়।

জন্মদিন

যুগ আর যুগন্ধরদের সঙ্গে যাত্রী।
পেল্লাই চেহারা নিয়ে·পল্লবিত মনে
কাছে এসে দাঁড়াতেই আমি সঙ্গোপনে
বলি, অপেক্ষা করবে শুধু একরাত্রি।
বছরে একটি দিন দিয়েছে বিধাত্রী
জন্মের উৎস খুঁজে দেখব নির্জনে
জন্মদিনে পাই কিনা মূল্য এ জীবনে,
জীবনের অর্থ-সন্ধানের সহযাত্রী।

ফস্কে গেল সেই দিন আঙুলের ফাঁকে
কার্ণিশে চড়ুইপাখী নেচেছিল ছন্দে,
সমাগত মুহূর্তটি এক যুগ আগে
দেয়ালে পেরেক বিদ্ধ হলাম আনন্দে
ছবিটাতে টিকটিকি সত্য কথা হাঁকে,
জন্মের আমেজ লাগে মরণের গন্ধে।

কথার অণু

আমার আজ সময় নেই, তোমারো যে নেই
সবটা দেখা-অদেখা এই জগতে যেমন
সময় হয় দেউলে তবু
কথায় চলে কথার বিরচন।

ডাকার আগে উড়তে থাকে ভাবনার পোকা
সময় আর হয় না বুঝি আমার
চলন বাঁকা সকল দিকে,
নিঃশেষে হয় না কাবার।

বাধ্যতার বাধা না হলে থমকে কি যায়
কান্নাও থামে না তখন ব্যথাও অশেষ
পাহাড় বেয়ে ধস নামে
একটু শুধু ঠোঁটের আবেশ

বাধ্যতা হয় সংজ্ঞা আর খুবই শাসায়
ইচ্ছে, করে তোমায় আমি করব লোপাট,
গুঁড়িয়ে মিশে যেতেই হবে
অনেক কথা ভেজায় কপাট।

আমরা কভু থাকব না তা' জানি
দাহ্য হয়ে রসায়নেই যেতে হবে মিশে
অণুর মত যন্ত্র দেহে
তৈল আর আগুনের শীষে।

কবিতা ওই দিনের বুকে লটকে যাবোই
তৃষ্ণা রূপে মর্ম মরু-সিংহদ্বারে
শকুন-ওড়া পৃথিবীতে
কথার অণু বাজবে বারে বারে।

অস্তিত্ব

ঢাক পেটাবার জন্যই বজায় আছি, বহাল আছি
ত্যাগের তক্তে বসা আমার স্বভাব—
মহাপুরুষের মত।
অনেক বিশ্বাসের বোঁটায় মিথ্যে ফল ঝোলে।
কৃপাপ্রার্থী নয় তবু কৃপা-যোগ্য।
আমি কৃপা করি তাদের
সম্মানিত যাঁরা, প্রেমে গাঁট কাটে,
বিচিত্রতায় ভাল, অথবা মহৎ।
গাঁট কাটার সার্থক, মহৎ-লাভের স্বর্গে
আমি সবচেয়ে বড় বিচারক—
তুলনা আমার নেই—শুধু মহাপুরুষ।
আমার অস্তিত্বে সকলে ধন্য
ঢক্কা নিনাদ শোনাবার শক্তিতে জানাই—
আমার তুলনা নেই,
কেউ জানে না—যা জানি,
যা আমি ভাবি কেউ ভাবে না।
যাত্রা দুই কদম আগেকার
ঘোড়ার মত মাথা উঁচিয়ে,
অথবা গন্ধ শুঁকে বাদুড় যেমন অন্ধ দিশায়
এই আশ্চর্য আমিকে পাখায় ঝাপটায়
শব্দের দাপটে আমিটা দাপটায়,
এই আমাকে জাগাই
শূন্যে নয় ভূমিতে নয় মানসী বজ্রাসন সেতুতে।

মসৃণ অবতারণ

সব পেয়েছির দেশে সব পাওয়া যায়
শাস্ত্র, তত্ত্ব, কথা কাটাকুটি, নরম ধৃতি
প্রতাপের তাপ, সন্ন্যাস, আর উগ্র সম্বিত
কাব্যধারা জলে আর সুরের ঝঙ্কারে
বিচিত্র পাওয়ার আস্তানায় শুধু প্রাপ্তি যোগ।
তৃপ্তির অববাহিকায় এখন মসৃণ অবতারণ।

সব পেয়েছির দেশে চাপ চাপ বুদ্ধি জমা
পাহারা-ঘেরা সুন্দর দরজা আটা
তোশাখানা। তাতে সুস্থ, অসুস্থ, দুর্বল,
অনবহিত—অসাবধান-জীবন বড় সুন্দর!
ঠোঁটের কোণে ধোঁয়ায় কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে—
অনেক কথা যতিযুক্ত। এখন মসৃণ অবতারণ।

সব পেয়েছির দেশে সব কিছু পেয়েছিলাম
মাছের মুণ্ডু, শাকের মাথা, রক্তাভ মাংসল কারি,
মসলা মেশান ক্ষীরোদ ঝোল-বাহ,
ঝাঁঝাল কোর্মা, শাঁসাল শিক-কাবাব,
শিকেয় তোলা পুরু সর-ভাজা
রসাপ্লব গোলক অথবা নাড়ু-মোয়া।
কিন্তু এখন মসৃণ অবতারণ।

এখন সব পেয়েছির দেশটা
টাকওলা জমিতে চিৎপাত। অথবা কোথাও
বন্যা ধৌত—পোষা সাপের কুণ্ডলীতে,
সব পাওনা কথার ভাঁজে, ভাঁজে রাখা
গণ্ডা গণ্ডা চিন্তা-জোড়া নানান শ্বেতপত্র।
এখন মুক্ত মাঠ চষা। মসৃণ অবতারণ।

প্রথম দিন

দিনগুলি এসেছে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে
আরো দিন সব হত্যা করে
নির্জন সন্ধ্যার গলা টিপে, সকালেরে পচিয়ে
পাঁকের বিপাকে, ধূলি ধূসরিত সরণীতে,
গ্যাস ও জীবাণুর কবলে,
যন্ত্র-শ্বাপদের নাড়ীতে ভাঁজ পাট হয়ে
টিকে থাকা না থাকার ফাঁকে ক্ষুধার দেনা চুকিয়ে।
দেহ প্রতিমারে ছুঁয়েছি মাঝে মাঝে, কিন্তু প্রতিদিন নয়,
জীবন্ত জিহ্বায় আষাঢ়ে আমের’ক্ষণিকা-রস পান
অথবা সবুজ রক্তাবেশময় মিষ্টি ভুলের মত
শরীরের প্রতি রন্ধ্রে, শিহরিত আভরণ।
তারপর ধরা যাক মানসের-কৃমিগুলোকে,
কোনখানে ডিম পেড়ে রেখে গেল?
অনুজ্ঞা করা যাক পাহারাওয়ালাকে
সে বলবে—“সেলাম হুজুর
কোনো পাওনা নেই শুধু দেনার বোঝা
সব ভাঁজ করে রাখলুম।”
রচনা দেনার জ্বালা বয়সের আগুনে
জ্বলে জ্বলে আরো প্রসারিত হল
চাপ চাপ ফোস্কা আজ মনের আড়ালে।
প্রতি দিনের বাড়ন্ত আগুন।
একটি জন্ম দিনে প্রমথের দেখা
ঘাতকের মত কর্ণ রন্ধ্রে, বলে বলছে—

"নমস্তে হুজুর! সর্বনাশের এক কাঁদি—
সবুজ চিন্তার সাথে যুগ অভিশাপের বিক্ষুব্ধ বিচ্ছু
জন্ম থেকে ঝুলছে কাঁধে"
রচনার জ্বালা এমনি সর্বনাশের শব্দে গাঁথা।

সিগ্‌ন্যাল

বেদেনীর ঝাঁপি বাঁধা একটি সুখের বোঁচকা
চাপ-ধরা গোল বাঁশের বাক্‌স
যাত্রীদের সুট্‌কেস, ঝক্‌ঝকে বিছানা, ইলিশ মাছ
অনেক বলাবলির মধ্যে ধোঁয়া-গালি-চানাচুর,
সমান বেঞ্চিতে একই ভাড়া
সুখের টিকিটে একই ছাপ—যাত্রী,
মাঠ আর জনতার মধ্য দিয়ে গতি, কিইবা তারতম্য

অক্ষ রেখা পার হয়ে চলে
প্রচণ্ড গোলক, বাষ্পতাড়িত ইঞ্জিন্‌,
নিয়ে যায় নিষ্কলুষ কথার গাড়িগুলো—
সবাই বাষ্প যুগে—হাসি কান্নার অঙ্গীকারে, থামে।
কথার গাড়িতে শরীরটা টেনে টেনে,
বুকের ভেতরে ধুক্‌ধুক্ ধুক্, কিন্তু কথার গাড়িতে
আর থেমে যেতে নেই।
চক্রকবর্ত্মে খালি বাঁশী বাজে, বাজে, বাজে
বর্ত্ম থেকে পথে যেতে যেতে—স্টেশান
সবুজ আরক্ত পতাকা বাহন শুধু।
তখন ওরা কথা বলছে কথার গাড়িতে।

লণ্ঠন সাজানো ভাঙা ছাতা আর ঝাঁপি
সব নিয়ে যন্ত্র থেকে নেমে যেতে হবে মাঠে
সময় যে নেই, অপেক্ষাও নয়
যুগের যন্ত্রটা চলেছে, কিন্তু নেমে যেতেই হবে।
সিগ্‌নালে আছে ঈর্ষা,
ধ্বসে পড়বার আগে নেমে যেতেই হবে মাঠে
ওরা তখন কথা বলছে কথার গাড়িতে
নেমে যেতে হবে মাঠে, নেমেই যেতে হবে—
সিগ্‌নাল সিগ্‌নাল।

ক্ষুধিত

"আলোর কেন জন্ম হল ?"
হেদোর তীরে দাঁড়ানো বেওয়ারিস বুড়ো ছেলের
পুরানো মনের কিলবিলে পোকার জিজ্ঞাসা।

এখন সরু লম্বাটে মেয়েটি একপাশে
হাঁড়ি পেতে উনুনের আগুনে
এক কুনকে চালের ভাত রাঁধে—
সংগ্রহের পরিতৃপ্তি ! চোখে চোখ রাখে লোকটা

ওপর থেকে ঝরছে আলোর ধূলো—
আকাশের একটি চাকার বিঘূর্ণনে,
সাঁতারুদের উঁচু কাঠের তক্তাথেকে
হেদোর চাঁদ পেঁজা তুলো ওড়ায়
ওদিকে জ্বলে লাইট পোস্টের চোখ।

ভিক্ষুকটা পাশ ফিরে শুয়েছে কেবল।
কিলবিলে কিলবিলে পুরানো পোকা।

বেঞ্চে বসে বেওয়ারিশ বুড়ো ছেলের ভাবনা—
"একটু আঁধার বরং ভালো ছিল,
আলোর কেন জন্ম ? লাইট পোস্টে কেন চোখ ?
থাকবে কি লম্বাটে মেয়ের ভাতের ক্ষুধা কাল ?"

ওড়ে ওড়ে কিলবিলে কিলবিলে পোকা।
আলোর কেন জন্ম হল ?
বেঁচে থাক অন্ধকারের চোখ।
সামনে আরো কালো দিন
ভাত রাঁধুনীর চাল আর কিলবিলে পোকার মন্ত্রণা
কিন্তু, এখন জ্যোৎস্না নয়—ওটা রাতের ক্ষুধা।

মন্দির

এই তো মন্দিরের দিক—সেখানে শুধু দেনা
এখন সস্তা বাতাসা, ফুল, ফল অথবা দামী
একখণ্ড ভক্তির ঠোঙ্গা
এক রাশি পবিত্রতার আস্ফালন
এবং স্বস্তির একটি তালিকা
এসব দেবতাকে নিবেদন প্রকল্প।
ভিড়ের মধ্যে কালান্তের জন্ম
মুখোমুখি শুধু ভিড়ের প্রার্থনা।

রিক্ততায় কোন পূজা নেই
বিবিক্ততা মনের দুঃসাহস শুধু।
সব নিয়ে আত্মতৃপ্তির পরীণাহ।

কিন্তু চরম প্রাপ্তির সন্ধানে
গেছে যারা হিমবাহের শেষ প্রান্তে
বিপুল মহাকাশের ঊর্ধ্বে
মরুবালুর আগুনে
চোখের একটুকু জ্যোতিতে—
কোথাও নেই, কোথাও নেই, কোথাও নেই

ইঁদুরগুলো কেটেকুটে শেষ করে উপনিষদ
কীটের সঙ্গে মহাভারতে থাকে, কালের উক্তি
টিকটিকি দেয়ালে সত্য কথা হাঁকে,
জিজ্ঞাসা পালায় মায়ামৃগের মতো—
যা নিত্যকার সৃষ্টি।
দেবতা আছেন মন্দিরে।

তখন খরা

তখন নাকি তালপুকুরে ঘটি ডোবে না
তখন নাকি আর নেই কোন পথ, অথচ আছে
মাঠ, ক্ষেত আর ওদিকে দালান কোঠা
কালো কুচকুচে শান্তিপুরী পাড়—
ধূসর কান্না কেটে চলে যায়।

দুধারে ছোট ছোট ছায়াঘন গাছ নেই
তখন শুধু চারা-গাছ গজায় নি বুঝি
মানুষেই শুধু গিজ্‌গিজ্‌ গিজ্‌গিজ্‌
তখন নাকি তালপুকুরে ঘটি ডোবে না।

তখন নাকি জন্ম মৃত্যু বিবাহের অঢেল পণ্য,
কিন্তু দেখা নেই পণ্ডিতের
উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে দেবার সময় বয়ে যায়।
ঢেউএর কাঁধে দীর্ঘ ফেনার রেখা
অথবা বেলাভূমির অগুণতি ঝিনুক।
আমরা ঘটি নিয়ে মাজা-ঘসা করি
—চেয়ে থাকার আদেশ আকাশে আর সমুদ্রে।

হাওয়া আসছে হাওয়া আসছে
অনেক বর্ষণ বাক্স-বন্দী রেখে পরিতৃপ্ত ওরা
পরিতৃপ্তির সমাধি নেই
কিন্তু তবু তালপুকুরে ঘটি ডোবে না।
তাই শুধু যজ্ঞশালায় বিজ্ঞজনের অর্চনা
মাঠটা ধুকছে আর ফুঁসছে।

মুদ্রা

অনেক সকালে,
আরক্ত নয়নে ঘুম ভাঙা সূর্য,
দক্ষিণে একটি খাল
পশ্চিমে তাম্বুল রঞ্জিত ঠোঁটের উচ্চারিত পণ্য
বামে দেয়ালের গায়ে ঊর্ণনাভ জাল
সামনে গলি পথ।

অতীত হয়ে যায় ওরা ধীরে ধীরে।
মাসের প্রথম দিনে ওরা থাকে—
পশ্চাতের টানে অর্থহীন,
ওরা অনর্থের স্বপ্নময়
দাবীর দুরন্ত কক্ষে কক্ষে
হুমকিতে গচ্ছিত থাকেই ওরা দূরে দূরে।

চক্ষু-নীল শূন্যতায় ওরা শুধু দীপ্তি
ঝলমলে প্রসন্নতায় ওরা শুধু দীপ্তি
প্রভাতী পকেটের দুটো চোখ,
ভোগমন্ত্রের ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত।
তারপর, মাসের প্রথম দিনে
তারপর—আরো কিছুক্ষণ,
আরো কয়েকটি দিন, আরো শূন্য দিন অদূরে

ওরা শুধু নিশ্চিন্ত অতীত
ঘুণধরা কাঠের জীবনে

ওরা অতীতের পূর্ণতায়
সরু সরু রেখা শুধু
উদ্যত রেখেছে হিসেবের আলপিন
বিপণী-পণ্যের বাড়ন্ত বাণীতে—
অন্য কোনখানে ওরা।

চির শৈশবের মত সুখে ওরা—
কিছুদিন পরে পরে প্রথমদিন রচনায়,
আজ ওরা শুধু ছিল, ছিল, ছিল।

হারিয়ে পাওয়া

হারিয়ে হারিয়ে পেয়েছ কখনো—
হারানো পাওয়ার মজা ?
নিশ্চিত আকাশের মত কিংবা খোলা মাঠের মতো নয়-
চাইলেই পাওয়া যাবে।
আসলে আমরা হারানো পাওনা নিয়ে
ষ্টেশন থেকে ষ্টেশনে সর্বস্ব খুঁজি।
যারা ধুকছে রোদ্দুরে,
শেষ হয়ে গেছে ওদের যা কিছু।
এরপর হারিয়ে খোঁজার জন্য মানুষ
ছুটে আসে দেখে দেখে খুঁজে যায়,
শূন্য শুষ্কমুখে বীভৎস ক্ষুধায়
বসে থাকে অবসন্ন, যারা হারায়।

এমন সময় অর্বাচীনেরাও খোঁজে
হারানো মাণিক প্রবীণেরা খোঁজে, খোঁজে অভিজ্ঞেরা।
মাঠও হারিয়ে গেছে, জলা হারিয়েছে
পুকুর চুরি হয়ে গেছে।
মেঘেরাও নাকি চুরি হয়ে যায়—
গর্বিত পৃথিবীর ধানের পালা থেকে,
যারা হায় হায় হায় করে কাঁদছে
তাদের ঘরের দোরে সাপের পাহারা বসেছে
নিতান্ত কৃতান্ত হয়ে।
আমরা বেরিয়ে পড়ছি
কোথা পাই, কোথা পাই, কোথা পাই.
হারানোকে পাবই আমরা পাবই
তারপর একদিন সকলে পাবই
ঝড়ের মধ্য দিয়ে, রৌদ্রের মধ্য দিয়ে
ক্ষুধার মধ্য দিয়ে, ক্লান্তির মধ্য দিয়ে
চুম্বনের মধ্য দিয়ে, ন্যক্কারের মধ্য দিয়ে
হারানোকে পাবই।
নতুন করে পাবই—
গভীরে, পাওনা হিসেবে কালির আঁচড়ে।

বলেছিলে

তুমি না সেদিন বলেছিলে
"আর চলতে পারা যায় না"
কি যে তোমার চিক্‌ চিকে আশা

ব্রহ্মরন্ধ্র, ভেদ—তোমার যোগ নয়
মানুষ হয়ে ভগবানের চাকরি ফট্ করা
দরকার কি? থাক সে সুখে শান্তিতে।

পথ চলার জ্বালা, পকেটে বন্দী আগুন
হাত পুড়িয়ে, যকৃতে ছ্যাঁকা লাগায়।
রক্তটা উল্টো ছোটে—হৃদয়ে অবরোধ।

এখনো তোমার বলা শেষ হয় নি
তোমার আরক্ত উদ্বেগ
একটা দর্পণের সামিল।

তুমি না সেদিন বলেছিলে
"এই জ্বালার শেষ হবে। দিনটা পেঁয়াজের খোসা
খুলে খুলে যাবে জ্বলন্ত তেলে।"

আকাশের ডিম, মাটিতে তার কুসুম হয় না
ঘূণে ধরা কাঠ গুড়ো হয়ে যায়
মাথার ওপরে যতই ঢাকা দাও—বজ্র ঝোলে।

তুমি সেদিন বলেছিলে, কিন্তু
মানুষের পোকা লাগা হাড়গুলো
এখনো বজায়—সহরে, বন্দরে, গাঁয়ে।

যদিও টিকে থাকার আমেজটা বানচাল,
কিন্তু আকড়ে সে শুধু বাড়ছে আর বাড়ছে।
কারণ এখন সবই বারুদের স্তূপে জমছে জমছে।

আমার হারিয়ে যাওয়া কবি-স্বপ্নের উদ্দেশ্যে

সংগীত-রূপক : আষাঢ়ের প্রথম দিনে

—সুকুমার রায়

সেদিন কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস
মহাকৈলাসের আশুচ্ছিন্ন-হস্তিদন্ত-দেহে
পরিয়ে দিতে নীল মেঘের উত্তরীয়
রামগিরি থেকে পাঠিয়েছিলেন কাজলকালো মেঘ।
মহাকৈলাস———প্রণয়ী।
প্রণয়ীক্রোড়ে বিগলিত বসনা,
জলদ-মৌক্তিক, কুন্তলকলাপী অলকাপুরী।
শঙ্করের রাশি রাশি হাসিপুঞ্জে পুঞ্জিত—
ত্রিদশ বণিতা দর্পণ,
রাবণের বাহুবলোদ্ধৃত গ্রন্থিশিথিল অচল হিমালয়কে
দিয়েছিলেন, চিরন্তন ভাষার অর্ঘ, কালিদাস।
তাইতো মৌনী-মৌলী-হিমালয় আমাদের চির দেবতাত্মা।
আজ এসেছে সেদিনের প্রথমা
মহাকবির পূর্বমেঘ, উত্তরমেঘ, আষাঢ়ের প্রথমদিনে
উত্তর-পথের-যাত্রী।
হে কবি, আজও আমরা যাত্রা করি মেঘদূতসঙ্গী হয়ে।
চির বিরহিণীর জন্যে আজও
এ বিরহগীতি—নিবেদন তাই—
যক্ষ, আর যক্ষপ্রিয়ার গীতি-রসে সিক্ত পাত্র :

যক্ষের গান

অভিশাপ শিরে বহি—বরষ যে কেটে যায়।
দিন আর কাটে না হে—দেহ ঝুরে হতাশায়
প্রাণ কেন দুখ চাহে—প্রিয়হারা নিরালায়
আষাঢ়ে প্রথম দিনে
বহুদূরে তোমা বিনে
গিরিবুকে মেঘ দেখে
রহি তোমার আশায়।

জলদের একি ডোর—কেন আনে চপলতা,
কেমনে জানাব প্রিয়ে—বেদনার শত কথা।
মেঘ, তুমি দূত হয়ে
হিমালয়ে যাবে বয়ে
অলকাপুরীতে যেথা
প্রিয়া মোর মূরছায়।

নারীকণ্ঠের গান
যে জন সুখী আপন মনে, দুঃখ যাহার নেইকো মোটে
সে দেখে মেঘ তারও চিত্তে, ব্যথার কুসুম আপনি ফোটে।

যক্ষের গান
হে কালোমেঘ তোমায় দেখে
দুঃখ যখন ওঠে জেগে
প্রিয়া রহে গিরির কোলে
বিরহের ব্যথায় লোটে।

তাই ওগো মেঘ তোমার আঁখি, মোর কামনায় দেব আঁকি
সঙ্গী নিয়ে চাতক পাখি যেও অলকাতে উঠে।
স্থলবেতসের কানন হতে
রেবানদীর পথে পথে
বিন্ধ্যাচলে পাড়ি দিয়ে
যেও উজ্জয়িনী ছুটে।

যক্ষের কথা
হে অতনু-প্রতীক আষাঢ়ে মেঘদল
চকিতে এসেছ রামগিরি শিলাচল।
হে কজ্জল মেঘ, তুমি, যাও দূর পথে
আম্রকূটে, রেবানদীতটে, দশার্ণতে
কদম্ব বনানীপ্রান্তে বিদিশা নগরে,
অবন্তীতে উজ্জয়িনী অট্টালিকাপরে,
গম্ভীরার শুভ্র ক্ষীণদেহ দেবে পাড়ি,
চর্মবতী, দেবগিরি কনখল ছাড়ি

হিমাচলে শিলাশিরে মানস-সরসে
অলকাপুরীর হর্ম্যে প্রিয়া যেথা বসে
আনমনে, বাপীতীরে লীলাপদ্ম হাতে
কুরুবক সাথে, কভু মাধবীর সাথে
রক্তাশোক, বকুলবীথির একপাশে
দিনযাপে প্রিয়হীন অশ্রুর বিলাসে।

জনপদ ললনার গান

অলকে কুসুমে তোমারে পূজিব, মোরা জনপদ ললনা
বিরহাবসান তোমাতে খুঁজিব, কোথা যাও তুমি বলনা
নয়নমোহন কালোরূপে তুমি
হৃদয়ের সুখ তুলেছ কুসুমি
বিরহী জনের বন্ধু হয়েছ
তুমি করোনাকো ছলনা।
চাতকের তুমি জীবন মোহন, বক বলাকারা তোমার সঙ্গী
প্রেম কথা হল ঘন-গরজন শ্যামসুন্দর তোমার ভঙ্গি।
চিত্রকূটের হৃদয়রতন
আম্রকূটের শিরেরভূষণ
স্থলকদম্বে প্রাণ দাও তুমি
বিদিশায় দাও জলকণা।

উজ্জয়িনী নাগরিকের কথা

হের, উজ্জয়িনী স্বর্গ, বসি হর্মশিরে।
বিলাসিনী রমণীরা শ্রান্তিশেষে ধীরে
চকিত চাহনি হানে, বিদ্যুৎ ঝলকে।
মিলন সমাধা করো আঁখির পলকে।
শিপ্রা নদীতীরে সুরভিত পদ্মগন্ধ
অলক্ত রঞ্জিত পদে সুখ কোলাহলে
সচকিত, রমণীয়, নাগরিকা-দলে
রাখবে চকিত দৃষ্টি, সন্ধ্যায় তুমিও
অভিসারী রমণীর নিবেদন নিও।

নাগরিকার গান

উজ্জয়িনী ভবনের শিরে চপলা জড়ায়ে বুকে
কপোতের সাথে যাপিও নীরবে একটি রজনী সুখে
প্রভাতের শেষে পদ্ম গন্ধে
শিপ্রানদীর স্রোতের ছন্দে
প্রিয়া সুখাবেশে থেকো আনন্দে
পুরীর রমণী লোকে।
কেশর সুরভি বাতায়ন হতে উড়ে যাবে আশ্বাসে
ময়ূরের নাচ সুরু হবে পথে প্রণয়ের অভিলাষে।
পুরবনিতার চকিত চাহনি
নাহি পেলে যদি এখানে অমনি .
বঞ্চিত হবে সঞ্চিত রসে
জীবন বিফল দুখে।

যক্ষের কথা

রাত্রির বিশ্রাম শেষে যাত্রা করো ধীরে
উত্তরাভিমুখে। গম্ভীরা নদীর তীরে
দাঁড়ায়ে ক্ষণিক দেখবে রূপসী নদী
বেতস বসনে ঢেকে নিতম্ব অবধি
লজ্জিত দেহেতে তোমার সোহাগ চাহে,
মিলন বিলাস দিও বিমল প্রবাহে।
দেবগিরি কুমারের অভিষেক হবে,
যেতে হবে, হে জলদ, সুখ ছেড়ে তবে—
চর্মবতী তীরে যেথা স্রোত বয়ে যায়,
ইন্দ্রনীল হবে তুমি মৌক্তিকের গায়।
এসো দশপুরে, কুরুক্ষেত্রে, কনখলে,
আরো দূরে জাহ্নবীর হিমশিলাচলে
পার্বতীর লীলাক্ষেত্রে—চন্দ্রশেখরের
পদচিহ্ন প্রদক্ষিণ করি, দূরে নূপুরের

মনোহর ধ্বনি শুনি গান্ধর্বীর গানে,
কন্দরে গর্জন করো ভরে দাও তানে।
আমার সঙ্গীতে ধ্যানমগ্ন হিমালয়
চির সুন্দরের স্বপ্ন, নির্জন-বিস্ময়।

গন্ধর্বগণের গান

তুমি এসেছ নবীন দেশে
হে নীল অম্বর কান্তি
দেখো অমল ধবল রূপে
রয়েছে অতুল শান্তি।
যবে মহেশ চলিবে পথে
তুমি ঝরিয়ে দিওহে বারি
দিও স্নেহধারা পর্বতে
যদি পরশে অমর নারী
মানসের তুমি নবীন-বিহারী
দূর করো পথ শ্রান্তি।
দেখো অলকার নারী সাজে
নব কুন্দ কুসুম কমলে
শোনো মুরজ মুরলী বাজে
হেথা মন্দার ছায়া তলে
চির যৌবন চপল রঙ্গে
দেহে আনে শুধু ভ্রান্তি।

যক্ষের গান

হেথা কুরুবক বীথি পাশে
দেখো মোর ছোটনীড় খানি
রহে প্রিয় যবে পরবাসে
তুমি দিও তারে মোর বাণী,

গন্ধর্বগণের গান

দেখো হরিণ নয়নে, অবশ অঙ্গে
এসেছে বিরহ ক্লান্তি।

যক্ষের কথা তারপর, নিশীথে সৌধবাতায়ন পথে দেখো—
আমার তন্বী শ্যামাঙ্গী প্রিয়া।
অধরোষ্ঠ সুনির্মল, লুব্ধদৃষ্টি-লব্ধ পক্কফল ;
হরিণ নয়নে চকিতা,
স্তনভার অবনতা, ক্লান্ত-দেহী ;
ক্ষীণ কোমরের ওপরে ও নিচের দেহে প্রবহমান গতি
তাকে সুন্দর করেছে যৌবনের কমনীয়তায়
সে আমার প্রিয়া—'ধাতার প্রথম সৃষ্টি।
হ্যাঁ, বিধাতার প্রথমতম সৃষ্টি সে
তাকেই দিও আমার বাণী :—
"স্বপ্নে তোমার কাছে এসে, প্রিয়ে,
প্রসারিত করেছি বাহু।
দুখ বুঝি ছেয়ে গেল সব,
দেবতার মুক্তাশ্রু বুঝি ছড়ায় পত্র পল্লবে।
ভগ্নদেবদারু পত্রপুট হতে নির্যাসগন্ধে-
হিমগন্ধবহ বুঝি তোমার অঙ্গ ছুঁয়ে এসেছে ?
শুধু মাস চারি
আর চারি মাস অপেক্ষা করবে
শারদ জ্যোৎস্নাপ্লুত মিলন রাত্রির জন্যে,
অয়ি চপললোচনে !"
হে পয়োধর,
মানসের এ সন্দেশ নিয়ে, এ খবরটি নিয়ে এসো ফিরে
আর, দিয়ে এসো বর্ষণ আর বর্ষণ
আমারই আত্ম-প্রসারিত শিথিল জীবনগ্রন্থিতে—
আর আমারই শিথিল কুন্দ পাপড়িতে।
তারপর, ফিরিয়ে নিয়ে এসো প্রিয়ার মধুক্ষরা বাণী।

যক্ষ প্রিয়ার গান

প্রাণের ভাষায় বেঁধেছি তোমারে
আমি তোমা লাগি ভাবি তাই
মরমবীণার একসুর বাঁধি তোমার স্মৃতির গান গাই।
আষাঢ়ের এই মেঘদল এসে
বলে যায় মোরে কত কথা হেসে
তোমার মনের যে বাণী এনেছে
সেথায় পরশ যদি পাই।
তোমার সরসে পদ্ম ফুটেছে
ভবন শিখিরা পেখম রচেছে
গুঞ্জরে অলি কুন্দ হেসেছে
সব আছে শুধু সুখ নাই।
প্রতিদিন পটে তোমারে এঁকেছি
দেহলীর পরে পুষ্প রেখেছি
অঝরে তোমার অশ্রু সঁপেছি
মোর দুখে কেবা দেবে ঠাঁই।

যক্ষের গান

বাতায়ন পথে বসিও নীরবে তাহারে হেরিতে সজনী
দেখো দিগন্ত-জোছনার মতো রহে সুন্দরী ঘরণী।

যক্ষ প্রিয়ার গান

খবর পেয়েছি দূর দেশ হতে
ধৈরয ধরে থেকো কোনো মতে
আর কিছুকাল সইব বেদন
সইবে সকল ধরণী।

যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়ারগান

এসো মেঘ এসো নিভৃত নীরবে
বরষিবে ধারা ঝর ঝর রবে
মিলন চেয়েছে চাতক চাতকী
সকল দিবস রজনী।